Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.3
Pages	31-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

রফিকুল ইসলাম

একুশের মতো মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও কবিতা লেখা হয়েছে বেশী। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশপ্রেম এবং মানবতাবাদী আবেগের স্ফুরণ ঘটেছিল, তা প্রকাশ করার জন্যে হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে কবিতার আঙ্গিকই উপযুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'হে স্বদেশ' (১৩৭৮) এবং 'উত্তরণে অমরত্ব' (১৯৭২) নামক দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়, দুটি সংকলনেই মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার প্রাধান্য ছিল। ঐ দুটি সংকলনের বার বছর পরে বের হয় 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা' (১৯৮৪) এবং পনের বছর পরে 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭) নামে আরো দুটি সংকলন। এই চারটি সংকলনে যদিও বেশ কিছু কবিতার পুনরাবৃত্তি আছে তবুও সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ঐ সব সংকলনে যাদের কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কবি জসীমউদ্‌দীন এবং বেগম সুফিয়া কামালও রয়েছেন, এ আলোচনা তাদের কবিতা দিয়েই শুরু করছি। 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা' (আবুল হাসনাত সম্পাদিত) সংকলনে জসীমউদ্‌দীনের দুটি কবিতা আছে— 'দগ্ধগ্রাম' ও 'মুক্তিযোদ্ধা'। প্রথম কবিতাটি ১৯৭১ সালের ২রা মে অর্থাৎ পাকিস্তানীদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর পরই লিখিত। এ কবিতায় তিনি তার চিরাচরিত সহজ সরল ভাষায় পাকিস্তানীদের বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তারও আগে ১৯৭১ এর ২৯শে এপ্রিল 'খবর' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন 'মায়া মরিয়াছে দয়া মরিয়াছে, মরিয়াছে মানবতা।' আর 'দগ্ধগ্রাম' কবিতায় মানবতার ঘাতকদের পরিচয় দিয়েছেন—

> কিসে কি হইল, পশ্চিম হতে নর-ঘাতকেরা আসি
> সারা গাঁও ভরি-আগুন জ্বালায়ে হাসিল অট্টহাসি।
> মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান,
> পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্ত-স্নান।

কে কাহার তরে কাঁদিবে কোথায়; যূপকাষ্ঠের গায়,
শত সহস্র পড়িল মানুষ ভীষণ খড়্গ ঘায়।

পশ্চিমের নর-ঘাতকদের ঐ রক্ত-স্নান প্রত্যক্ষ করে প্রবীণ কবি জসীমউদ্‌দীন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা কল্পনা না করে পারেন নি। কবিতা হিসেবে 'মুক্তিযোদ্ধা'র মূল্য বা গুরুত্ব যা-ই হোক না কেন, ১৯৭১ সালের ৬ই জুলাই মুক্তিযুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে রচিত কবিতায় যে বয়োবৃদ্ধ কবি জসীমউদ্‌দীন মানসিক মুক্তিযোদ্ধা বনে গিয়েছিলেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ—

আমি একজন মুক্তি-যোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগি।
কখনো সে ধরে রেজাকার বেশ, কখনো সে খান-সেনা
কখনো সে ধরে ধর্ম লেবাস পশ্চিম হতে কেনা।
কখনো সে পশি ঢাকা-বেতারের সংরক্ষিত ঘরে,
ক্ষেপা কুকুরের মরণ-কামড় হানিছে ক্ষিপ্ত স্বরে।
এ সোনার দেশে যতদিন রবে একটিও খান-সেনা,
ততদিন তব মোদের যাত্রা মুহূর্তে থামিবেনা।

কবিতার আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গী যা-ই হোক না কেন কবি জসীমউদ্‌দীন যে বাংলাদেশের শত্রুদের যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন সেটাই আসল কথা। সুফিয়া কামালের কবিতা সম্পর্কেও একই কথা, 'আজকের-বাংলাদেশ' কবিতায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা আর দেশের পতাকা উভয়কেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—

মুক্তিকামী সেই সেনাদলে
স্মরিতে আনত হয় হিয়া
যাঁরা মুক্তি মূল্য দিয়া
অশংকিত প্রাণ
আজি এ পতাকা ধরি তাঁদের সম্মান
জানাইতে ভুল নাহি হয়
শতাব্দীর অন্তেও সে রহিবে অক্ষয়।—
আপনারে মুক্ত করি যে সংগ্রামী বীর
দাঁড়াল উন্নত হয়ে পশ্চাতে সে
আর হটিল না
সহস্র তরঙ্গসম অযুত উন্নত শির সেনা

আনিল মুক্তি দিশা রক্তাক্ত সে লেখা
আমার এ বাংলাদেশে উড়িতেছে
আমার পতাকা

বাস্তবিকই আমার এ বাংলাদেশে উড্ডীন সোনার বাংলা খচিত আমার পতাকা, এ যে কি আনন্দ ও গৌরবের তা ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ পতাকা উত্তোলনের মুহূর্ত থেকে ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সময় পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করেছি, যে উন্মাদনা সুফিয়া কামালের কবিতাকেও স্পর্শ করেছে। তরুণ কবি মেহেরুন নেসা, ষাটের দশকে এ দেশের সাহিত্য অঙ্গনে একটি পরিচিত নাম ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি মা ও দুই ভাইসহ নৃশংসভাবে নিহত হন পাকিস্তান বাহিনীর হাতে, বেগম সুফিয়া কামাল তাকে স্মরণ করেছেন 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' বলে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে—

কুমারী, কিশোরী শাহানা রঙে মেহেদী লাগেনি হাতে
জালিম কাফের পিশাচেরা সেই হাতে
অসহায়া মেয়ে মোর।
শাণিত ছুরিকা হানিয়া কণ্ঠে তোর
তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিল, রক্ত বাসনা তুই
পূত পবিত্র এক মুঠি ফুল; —
তাই বুঝি তোর কুমারী তনুতে জড়ায়ে রক্ত বেশ
প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে
দুটি ভাই আর মায়ের তপ্ত বক্ষ রক্তে নেয়ে
দেশের মাটির পরে
গান গাওয়া পাখী, নীড়হারা হয়ে
লুটালি প্রবল ঝড়ে।--

মেহেরুন নেসার মর্মান্তিক হত্যাকান্ড পাকিস্তানী পৈশাচিকতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবী নিধনের মধ্য দিয়ে, পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধ শেষ করেছিল বুদ্ধিজীবী হননের মাধ্যমে। কবি মেহেরুন নেসার অবস্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রথম কাতারে, জীবন শুরু না হতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাকে।

বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রজ আবুল হোসেন 'পুত্রদের প্রতি' কবিতায় এক বাঁশিঅলার কথা বলেছেন, হ্যামিলনের বাঁশিঅলার মত যিনি সব ছেলেদের ঘরছাড়া করবেন, যারা আর ঘরে ফিরবেনা, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্যে বাংলাদেশের একটা পুরো প্রজন্ম ঘর ছাড়া হল, অনেকে হারিয়ে গেল। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারে নি ঘরে তাই কবি সে পুত্রদের প্রতি বলেন—

তোমরাও যেতে চাও, যাও। প্রশ্ন আর
ক'রবো না। চাইনে জানতে কিছু। যাবে যাও, যার
ইচ্ছে। বারণ করবোনা। কে শুনবে নিষেধ এখন?—
— উড়িয়ে রঙীন
নিশান, উঁচিয়ে লাঠি, সবাই বেরুবে পথে, যাবে
মাঠে মিছিলে সভায়, যখন বাজাবে
বাঁশি সেই বাঁশিঅলা। সারা দেশ উজাড় ক'রে সে
নিয়ে যাবে। —
জানি, তোমাদের কণ্ঠস্বর
শুনবো না আর কোনদিন, দেখবো না কারো মুখ।
সমস্ত একক স্বর, মুখ গিলে খাবে সর্বভুক
সে জনতা। এতদিনে আমিও হলাম নিঃসন্তান।—

আবুল হোসেন 'ভালোই করেছো' কবিতায় শত্রুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভয় দেখাবার জন্যে, নইলে ভয় ভাঙতো কেমন করে? মেরে পথ দেখাবার জন্যে নইলে আমরা এমন সহজে মৃত্যুকে পার হতাম কেমন করে? আবুল হোসেনের 'ভালোই ক'রেছো' কবিতায় যে বাঁশীঅলার উল্লেখ, যিনি একাত্তরের সাতই মার্চ রমনার মাঠে তার সেই ঘর-ভোলানো সুরে বাঁশী বাজিয়েছিলেন, তাকে নিয়ে অন্যতম অগ্রজ আধুনিক কবি সানাউল হক লিখেছেন 'সাতই মার্চ একাত্তর' নামে দুটি সনেট। এক নম্বর সনেটের শেষাংশ—

সেই মাঠে শুনি বজ্রকণ্ঠ, কী ঘোষণা বীজ হলো বোনা
অকাল বৈশাখী সেকি, হাতে-হাতে উঁচু যষ্টি সমস্বর,
বাংলার গৃহ হলো দুর্গের প্রতীক, বাংলার মন
হলো সিদুঁরে ইশান, হারানো সময় সূর্যমেঘ সোনা,
সন্ত্রাসের প্রান্তিক প্রহর জ্যোতির্ময় তুমি শক্তিধর;

তারপর দৃশ্যান্তর, মুখের সমগ্র মূক জনগণ।

সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে সানাউল হক বিপ্লবের ঘন্টাধ্বনি, বঙ্গোপসাগরের শব্দের সম্ভারের চিত্রকল্পে, বঙ্গোপসাগরের অবিস্মরণীয় ঝড়ের পূর্বাভাষে এবং একাত্ম সঙ্গীত রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাস্তবিকই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ অপরাহ্নে রমনার মাঠে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শ্রবণ ছিল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। যে অভিজ্ঞতা বর্ণনার অতীত। কবিতায় চেষ্টা করেছেন সানাউল হক—

বিপ্লবের ঘন্টাধ্বনি অবিস্মরণীয় ঝড়–পূর্বাভাষ:
কে সে বন্ধুজন শব্দের সম্ভার যিনি বঙ্গোপসাগর
অতঃপর একাত্ম সঙ্গীত, যৌথশ্রম, ফিরে–পাওয়া দেশ
মরণার্থী কালোত্তর, হে ঈশ্বর আল্লা, জীবন প্রহরী
খড়ের আগুন হলো পৌষের আগ্রহ, নক্ষত্রের আলো
মুক্তি সেনা চিতার শরীর, বাংলার ন'মাসী উন্মেষ
কখনো কাতর; অকাতর রক্তক্ষরা ধাবমান তরী,
অশৌচ আতুর ঘরে সর্বেঝাঁঝ, রুদ্ধদ্বার ছায়াকালো:
সেখানে আমার জন্ম–কী আনন্দ স্বাধীন বাংলাদেশ।

যে আতুর ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সে ছিল এক ধ্বংস স্তূপ, কমরেড মাও সে–তুং একবার বলেছিলেন পারমাণবিক ধ্বংস স্তূপের মধ্য থেকে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে, একাত্তরের নয় মাসে বাংলাদেশ কি এক পারমাণবিক ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়নি? সানাউল হক 'সাতই মার্চ একাত্তর' কবিতায় 'কী আনন্দ স্বাধীন বাংলাদেশ' এই উল্লাস ধ্বনি দিয়েছিলেন আর 'এগারোই ডিসেম্বর একাত্তর' স্বাধীনতার এই লগ্নে 'মুখোমুখি সন্ধিক্ষণে' তিনি সেই ধ্বংসস্তূপের পরিচয় দিয়েছেন—

প্রায় অবশেষঃ তান্ডবের অগ্নিযজ্ঞে বাংলার মুখ পোড়ে,
বর্বর আঘাতে দীর্ণ মার্তিক মৃত্তিকা, নারী – মাতৃকতা স্মৃতি,
চূর্ণ মঠ শহীদ মীনার চূড়ো, স্তব্ধ ধ্বনি বাংলার
সায়াহ্ন চিলের কণ্ঠ, ভিটে মাটি ছাড়া মূর্তি ছিন্নমূল নিরাপত্তাঃ
(এখনো জীবিত যারা নাকে–দড়ি–মাছ গোয়ালে র ক্ষিত পশু
প্রত্যহ প্রস্তুত কখন উঠবে নাম কশাইয়ের তালিকায়)
ইতিমধ্যে বেশুমার অস্থীতি কে গুনবে কঙ্কালের কেশ
সুচিরা বাংলা ছাই ম্লান যেন বিলুপ্ত যুগের রূপকথা

যেন এক আর্ত বিষণ্ণতাঃ জননী আকুলা শোকে, জায়া কাঁদে
কী বিভ্রান্ত যুবকের পিতা, কী শঙ্কিতা ঘরে এয়োতী কিশোরীঃ
এই এসে এই বুঝি আসে যেমন প্রদীপ বাত্যার সন্ত্রাসে
বাংলার খেয়াঘাট কবিতার মুখ চিহ্নিত হলো কি এসে।

সানাউল হক বার পংক্তির ঐ কবিতায় একাত্তরের নয় মাসের বাংলাদেশের চিত্রকল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

একাত্তরের বাংলাদেশের বিশেষতঃ অবরুদ্ধ নগরী ঢাকার চিত্রকল্প শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থে সংকলিত চৌদ্দটি কবিতায় কি ভাবে বিধৃত হয়েছে তার বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'ঢাকা যখন শত্রুপুরী ছিল, তখন একদিন দুই মুক্তিযোদ্ধার হাতে এসে পৌঁছল গোপন কিছু পাণ্ডুলিপি। সেই হলো শামসুর রাহমানের নতুন কবিতাঃ সৈন্য-শাসিত বাংলাদেশের ভিতর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া স্বর। -- আর, এই কবিতাগুলি যেন সেই বন্দীশালা থেকে তুলে ধরা স্বাধীনতার নিশান।' 'বন্দী-শিবির থেকে' প্রথম কলকাতা থেকে বাহাত্তর সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বন্দী শিবির থেকে' একাত্তরের একুশে জুলাই তারিখে রচিত, অবরুদ্ধ শহরে আটকে পড়া কবির আবেগের প্রকাশ—

বন্ধুরা তোমরা যারা কবি,
স্বাধীন দেশের কবি, তাদের সৌভাগ্যে
আমি বড় ঈর্ষান্বিত আজ।
যখন যা খুশি
মনের মতন শব্দ কী সহজে করো ব্যবহার
তোমরা সবাই।-
অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ
এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ

শামসুর রাহমান অবশ্য শুধু কবিতা লেখার অধিকার হরণের কারণে খেদ প্রকাশ করছেন না, তার যন্ত্রণার কারণ কিছু শব্দকে ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে

ওরা বেআইনী করেছে তাই। সেই শব্দগুলো কি? বিশেষতঃ কোন শব্দটি সবচেয়ে ভয়ানক এবং বিস্ফোরক?

স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ ক'রে বার বার
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে কানাচে
প্রতিটি রাস্তায়
অলিতে গলিতে
রঙিন সাইন বোর্ডে, প্রত্যেক বাড়িতে
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
লিখে দিতে চাই
বিশাল অক্ষরে
স্বাধীনতা শব্দ এতো প্রিয় যে আমার
কখনো জানিনি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক
স্বাধীনতা, বাংলাদেশ –এই মতো শব্দ থেকে ওরা
আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখছে সর্বদা।

কিন্তু শামসুর রাহমানকে দখলদার পাকিস্তানী ফৌজ একাত্তরের নয় মাস অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে 'স্বাধীনতা' ও 'বাংলাদেশ' এ দুটি ভয়াবহ বিস্ফোরক শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি কারণ বন্দী দশাতেও কবি এ দেশের গাছের পাতায়, রাস্তার ফুটপাতে, পাখির পালকে, নারীর দু'চোখে, পথের ধূলায়, বস্তির দুরন্ত ছেলেটার হাতের মুঠোয় সর্বদাই স্বাধীনতা নামক শব্দটি জ্বলতে দেখেছেন। এই স্বাধীনতাকে পাবার জন্যে 'আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন'? এ প্রশ্ন রেখেছেন শামসুর রাহমান 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়, স্বাধীনতার জন্যে বাঙালীকে কি মূল্য দিতে হল তার একটি তালিকা দিয়েছেন কবি—

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে

তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।

শামসুর রাহমানের এ কবিতায় স্বাধীনতার জন্যে প্রতীক্ষারত এমন কিছু মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা এমনিতেই অসহায়, যেমন উদাস দাওয়ায় বসা এক থুথুরে বুড়ো যার চোখের নীচে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলিক, দগ্ধ ঘরের নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকা মোল্লাবাড়ির এক বিধবা, পথের ধারে থালা হাতে হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী। কিন্তু তারাও স্বাধীনতার জন্যে পথ চেয়ে আছে, আর যারা সেই স্বাধীনতা আনতে গেছে তারা?

সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ, যার পদ ভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে।

হ্যাঁ, একটা নতুন পৃথিবীর জন্মের আশাতেই হানাদার-কবলিত বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ আশায় বুক বেঁধে বেঁচেছিল। শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার শেষ স্তবকে নিশ্চিত আশার বাণী ধ্বনিত হয়েছে, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে—

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে,
নূতন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়

তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

যে স্বাধীনতার জন্যে এত রক্ত, এত ত্যাগ সে স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন শামসুর রাহমান 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়। এ কবিতাটিকে গদ্যে রূপান্তরিত করলে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায়—

স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের অজর কবিতা, অবিনাশী গান। মহান পুরুষ কাজী নজরুল
ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা।
পতাকা-শোভিত স্লোগান মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক,
বটের ছায়ায় মেধাবী শিক্ষার্থী শাণিত তার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ,
চা খানায় আর মাঠে ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক,
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
খোকার গায়ের রঙীন কোর্তা
খুকীর তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
স্বাধীনতা কবির যেমন ইচ্ছে লেখার কবিতার খাতা।

স্বাধীনতার যদি ঐ অর্থ হয় তা হলে বুঝি স্বাভাবিক বাংলাদেশ স্বাধীনতার অপর নাম, যা থেকে বাঙালী বঞ্চিত অন্যথা পথের কুকুরের যতটুকু স্বাধীনতা অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ তা থেকেও বঞ্চিত কেন? একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে কিভাবে কেটেছে তাদের? একাত্তরের একুশে জুলাই রচিত 'পথের

কুকুর' কবিতায় শামসুর রাহমান বন্দী ও প্রাণভয়ে ভীত মানুষের সে চিত্র এঁকেছেন—

আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা
ওঁরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা
আমরা ক'জন
কবুরে স্তব্ধতা নিয়ে ব'সে আছি। নড়িনা চড়ি না
একটুকু এমন কি দেয়ালবিহারী টিকটিকি
চকিতে উঠল ডেকে, তাকেও থামিয়ে দিতে চাই,
পাছে কেউ শব্দ শুনে ঢুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিত্ত
নিরাপত্তা আমাদের। সমস্ত শহরে
সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
পথে ঘাটে ঘরে যেন প্লেগ বিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।

পথের কুকুরও বারবার তেড়ে যায় জলপাই-রঙ সশস্ত্র সৈন্য বোঝাই একটি জীপের দিকে কিন্তু অসহায় মানুষের সে সাহস নেই। কুকুর পথে থাকতে পারে কিন্তু হানাদার কবলিত বাংলাদেশে পথে বেরুলে বাঙালীর কি হয়? একাত্তরের পনেরোই আগষ্টে লেখা 'প্রাত্যহিক' কবিতায় তার বিবরণ—

ছাত্র নই, মুক্তিসেনা নই কোনো, তবু
হঠাৎ হ্যান্ডস্ আপ ব'লে
পশ্চিমা জওয়ান আসে তেড়ে
স্টেনগান হাতে আর প্রশ্ন দেয় ছুঁড়ে ঘাড় ধ'রে
'বাঙালী হো তুম?' আমি রুদ্ধবাক, কী দেব জবাব?
জ্যোতির্ময় রৌদ্রালোকে বীরদর্পী সেনা
নিমেষেই হয়ে যায় লুটেরা, তস্কর।
খুইয়ে সামান্য টাকাকড়ি,
শ্বশুর প্রদত্ত হাতঘড়ি কোনোমতে

প্রাণপক্ষী নিয়ে ফিরি আপিস কন্দরে।

এ কবিতায় একাত্তরের বাংলাদেশের কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যা ছিল নৈমিত্তিক যেমন, 'রাত হ'লে এমন কি দিন দুপুরেই কেবলি দৌরাত্ম্য বাড়ে রাজাকার, পুলিশ এবং সৈনিকের। ধরপাকড়ের নেই শেষ' অথবা 'মাঝে মাঝে মধ্যরাতে নারীর চীৎকারে ঘুমভাঙে'। কবিতাটির শেষ স্তবক একাত্তরে পাকিস্তানী দালাল অর্থাৎ মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি সত্তরের নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি ফ্যাসিস্টদের কর্মতৎপরতার ফিরিস্তী—

তুমুল গাইছে গুণ কেউ কেউ কুণ্ঠাহীন খুনী
সরকারের, কেউ কেউ ইসলামী বুলি ঝেড়ে তোফা
বুলবুল হতে চায় মৃতের বাগানে।
কেউ বা জমায় দোস্তি নিবিড় সন্তিতে
ভ্রাতৃঘাতকের সাথে। গদগদে দালাল
বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা
রটাচ্ছে শান্তির বাণী লাঠি সোটা নিয়ে।
অলিতে গলিতে দলে দলে
মোহাম্মদী বেগ ঘোরে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার।
নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।

বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের দিন যতই যাচ্ছিল ততই এই সব দেশীয় দালালদের অত্যাচার এবং উৎপাত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান বাহিনী ছিল নিঃসঙ্গ, বাঙালী নিধন যজ্ঞ এবং বাংলাদেশে ধ্বংস যজ্ঞ সে নিজেই চালিয়েছে কিন্তু বাঙালীর প্রাথমিক প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষ হবার পর মুক্তিবাহিনী যতই সংগঠিত হয়েছে, এবং দেশের ভেতরে তৎপরতা বেড়েছে ততই বাঙালী শায়েস্তার দায়িত্ব বিভিন্ন দেশীয় দালাল বাহিনীর হাতে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এবং সীমান্ত চৌকি ও রণ কৌশলগত ঘাঁটিতে তাদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। পাকিস্তানীরা এ দেশ চিনতো না জানতো না কিন্তু দেশীয় দালালরা চিনতো ও জানতো ফলে এদের অত্যাচার ছিল নিরন্তর। একদিকে পাকিস্তান বাহিনী অপর দিকে দালাল বাহিনীর অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণে নিরীহ বাঙালীর জীবন

ছিল মানবেতর। উদ্ধৃত কবিতায় (একাত্তরের তেরই আগস্ট রচিত) বর্ণিত হয়েছে বাঙালীর প্রতিক্রিয়া—

বিষম দখলীকৃত এ ছিন্ন শহরে
পুত্রহীন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করুন,
সৈনিক ধর্ষিতা তরুণীকে
জিজ্ঞেস করুণ,
কান্নাক্রান্ত সদ্য
বিধবাকে জিজ্ঞেস করুন,
বাঙালী শবের স্তূপ দেখে দেখে যিনি
বিড়বিড় করছেন সারাক্ষণ, কখনো হাসিতে
কখনো কান্নায় পড়ছেন ভেঙে– তাকে
জিজ্ঞেস করুন,
দগ্ধ, স্তব্ধ পাড়ার নিঃসঙ্গ যে–ছেলেটা
বুলেটের ঝড়ে
জননীকে হারিয়ে সম্প্রতি খাপছাড়া
ঘোরে ইতস্তত, তাকে জিজ্ঞেস করুন,
এখন বলবে সমস্বরে, যুদ্ধই উদ্ধার।

এ ভাবেই নয় মাসে দ্রুত বাংলার আবাল বৃদ্ধ বণিতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থের শেষ কবিতা 'মধুস্মৃতি,' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিন চালাতেন মধুদা, পঞ্চাশ ও ষাট দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলের প্রিয় মধুদা, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ, মধুর ক্যান্টিনই ছিল বাংলাদেশের সমস্ত আন্দোলনের সূতিকাগার। পাকিস্তান বাহিনী তাকে চিনতে ভুল করেনি এবং একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে তাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। শামসুর রাহমান 'মধুস্মৃতি' কবিতায় তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধুদার অগণিত অনুরাগী ভক্তের তরফ থেকে—

আপনি ছিলেন প্রিয়জন আমাদের
বড়ো অন্তরঙ্গ নানা ঘটনায়
উৎসব এবংদুর্বিপাকে। বুঝি তাই আপনার রক্তে ওরা মিটিয়েছে তৃষ্ণা
আমাদের প্রিয় যা কিছু সবি তো ওরা
হত্যা করে একে একে। শহীদ মিনার

অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়,
ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
দারুণ আক্রোশে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে, কে জানে কোথায়।
বটতলা করে ছারখার।
আমাদের প্রিয় যা কিছু সবি তো ওরা
হত্যা করে একে একে।
আপনার নীল লুঙ্গি মিশেছে আকাশে,
মেঘে ভাসমান কাউন্টার। বেলা যায়, বেলা যায়
ত্রিকালজ্ঞ পাখি ওড়ে, কখনো স্মৃতির খড়কুটো
ব্যাকুল জমায়। আপনার স্বাধীন সহিষ্ণু মুখ
হায়, আমরা তো বন্দী আজো–মেঘের কুসুম থেকে
জেগে ওঠে, ক্যাশবাক্স রঙিন বেলুন হয়ে ওড়ে।

মধুদার মতো অসংখ্য প্রিয়জনের হননে স্বভাবতঃই কবি বেদনায় আকুল, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, ক্ষোভে, ক্রোধে জ্বালাময়। কবির প্রিয় স্বদেশকে যারা রূপান্তরিত করেছে নরকে আর স্বদেশবাসীকে সেই নরকের বাসিন্দা তাদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ছাড়া তার আর কিছু নেই। তাই শেষ পর্যন্ত শামসুর রাহমান তাদের অভিশাপ দেন, অন্যত্র প্রকাশিত কবিতা 'অভিশাপ দিচ্ছি'তে—

আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত,
সিঁড়ি ভেঙে যেতে,
ভাসতে নদীতে, আর বন বাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি, ওরা বিশীর্ণ গলায়
নিয়ত বেড়াক বয়ে গলিত নাছোড় মৃতদেহ–
অভিশাপ দিচ্ছি,
ওদের তৃষ্ণার পানপাত্র প্রতিবার
কানায় কানায় রক্তে উঠবে ভরে, যে রক্ত বাংলায়
বইয়ে দিয়েছে ওরা হিংস্র
জোয়ারের মতো।
অভিশাপ দিচ্ছি।

এমনতরো অভিশাপের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করে প্রবাসী হননি, দেশেই ছিলেন, দেশের মানুষের দুঃখ, বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রনা, ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণাকে নিজের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের আর একজন প্রধান কবি হাসান হাফিজুর রহমানও দেশত্যাগ করেন নি, প্রথম একুশের সংকলনের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে স্বজন-হারা ভিটেমাটি হারা হয়েও দেশ ছাড়েননি, ছিলেন দেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে, সে অভিজ্ঞতার ফসল তার কবিতা সংকলন 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' প্রথম কবিতা 'আদিম অক্ষররাশী', বোঝা যায় কেন দেশত্যাগী হ'তে পারেননি তিনি—

পলি রঙ হাত দিয়ে অঙ্গার কালো শ্লেটের ওপর
যখনই প্রথম লিখলে আদ্যাক্ষর 'অ'
লিখলে একটি সভ্যতার নাম।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আলাওলের হাতে তুলে দিলে কুন্দ কুসুম
প্রীতি উপহার বিনিময়ে পেলে ছাড়পত্র হাতে
নজরুল-রবীন্দ্রের মহতী সভার।—
একবার বাঙলার রোদ জলে বেড়ে উঠে
কংক্রিটে অথবা পীচে যে পথেই হাঁটিনা কেন,
যত দ্রুত যাই প্লেনে কিম্বা কারে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে
যতই ঠেকাই না আদিগন্ত আবহাওয়া, আদিম অক্ষররাশি
অ আ ক খ আমাকে রেখেছে ধ'রে।
গলায় ফোটে না স্বর যদি না দূর পিতা পিতামহের
কণ্ঠে কণ্ঠ রাখি, চেতনায় ফোটে না একটিও ফুল
যদি না বাঙলার বর্ণনা শিখে থাকি।

বাংলা বর্ণমালার বন্ধনে আবদ্ধ যে কবি মহা দুর্দিনেও দেশের মাটি ছেড়ে যেতে পারেন নি কি যন্ত্রণায় তিনি শত্রুর লাশ চাইতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। 'শত্রুর লাশ চাই' কবিতায় সে হুংকার শোনা যায়—

ব্যারিকেড ঘিরে আমূল বাংলা ভূমি
শান্তির নামে তোলে সঙ্গীন।
রক্তে রাঙিয়ে পলি কালো মাটি, তাকে
তারা বলে, সংহতি রঙীন।

মিছিলের মুখে লাশ নিয়ে তবু ফিরি,
জাগ্রত করি করুণা কিসের?
করুণার মূলে ক্রোধের আগুন, আজ
সর্বশরীর জ্বলছে বিষের।
নিহত ভায়ের লাশ কাঁধে বয়ে ফের
গড়েছি মিনার, হেঁটে গেছি পথ।
আর নয়, চাই শত্রুর লাশ চাই,
এইবার এই বজ্রশপথ।।

নিহত ভাইয়ের লাশ নয়, শত্রুর লাশ চাই যে শত্রু প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্তাক্ত করেছে, 'এখন সকল শব্দই' কবিতাতে সে অবিনাশী হুংকার—

আমার নিশ্বাসের নাম স্বাধীনতা,
আমার নিশ্বাসের নখর এখন ক্রোধের দারুণ রঙে রাঙানো,
দুঃস্বপ্নের কোলবন্দী আমার ভালোবাসা
এখন কেবলই
এক অহরহ চিৎকার: হত্যা কর, হত্যা কর।
হীনতম বিভীষিকার কালো দাগে মোড়া
বাংলার
গর্জমান বাতাস এখন আর কিছু বোঝে না।
এখন সকল শব্দের একটিই মাত্র আওয়াজ: অবিনাশী হুংকার।

মুক্তিযুদ্ধের সময় হাসান হাফিজুর রহমানের দুই সহোদরকে পাকিস্তান বাহিনী হত্যা করেছিল, স্বভাবতঃই হাসানের বেদনা ও ক্রোধের কারণ অনুমেয় কিন্তু এই ব্যক্তিগত শোক মুক্তিযুদ্ধের কারণে সমষ্টিগত শোকে পরিণত হয়, 'আমরা পারিনা কাঁদতে' কবিতায় শোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—

'একজন নয়, তোমার দুই দুইটি সহোদরের রক্তে
ওরা মাটি ভিজিয়ে দিলো,
তবু তোমার শোক নেই কেন?'
'দুই নয়, বরং বলো, দশ লক্ষ সহোদরের
শহীদ শোণিত চারপাশে ভাসে।
আমি একা, কোটির বিলাপ করবো কি করে?'

আমরা পারি না কাঁদতে
শুধু শিলীভূত হই শেষ আঘাতের অমোঘতায়।।

সোনার বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের নতুন পতাকা একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশের নিসর্গকে বদলে দিয়েছিল, বাঙালী আর অর্ধ-চন্দ্র শোভিত পাকিস্তানী পতাকা ওড়ায়নি। নতুন পতাকায় সবুজ প্রান্তরে লাল সূর্যের মধ্যে ছিল সোনার বাংলার মানচিত্র (মানচিত্রটি পরে বাদ দেওয়া হয়) আর জাতীয় সংগীত ঘোষিত হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা' ফলে সোনার বাংলাদেশ কল্পনা থেকে বাস্তবে রূপ নিতে পারছিলো, হাসান সেই পতাকা আর মানচিত্র নিয়ে কবিতা লেখেন, 'তোমার আপন পতাকা' এবং 'একান্ত মানচিত্র বাংলার'—

এবার মোছাব মুখ তোমার আপন পতাকায়।
হাজার বছরের বেদনা থেকে জন্ম নিল
রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল
নিঃশঙ্ক হাওয়ায় আজ ওড়ে, দুঃখ ভোলানিয়া গান গায়।
মোছাব তোমার মুখ আজ সেই গাঢ় পতাকায়।

—অথবা

এখন পতাকার মতো সে আলাদা, তবু যত খুশী
তাকে ওড়াও ওড়াও। প্রতিবার তোমার হৃৎপিন্ডের
সমস্ত আরক্ত রঙ দেখ, তোমার জলজ পরিপার্শ্বের
সমগ্র শ্যামলিমায় ঘন হয়ে যাও। সে আজ
সমস্ত শরীর মেলে দিয়ে একান্ত মানচিত্র বাংলার
আপামর বাংলার আজীবন জয়তু সমস্বর হয়ে গেছে।

এই পতাকা, এই মানচিত্র ছেড়ে কবি কোথায় যাবেন? 'পালাব কোথায়' কবিতায় তিনি বলছেন, দুঃস্বপ্নের উনুনের ওপর পাতা শয্যা থেকে দৌড়ে পালাতে চেয়েছেন কতবার, সংকল্প নিয়েছেন, না আর নয় এই অধঃপাতে ফিরে আসা, এমন দোজখে কোনোমতে আর নয় কিন্তু কি করে পালাবেন তিনি? আদিগন্ত বাংলাভূমি এমনই কঠিন কারাগার, চারদিকে উঁচানো সঙ্গীন, তাই এখানেই বাঁচবার ভিন্নপথ ধরতে হয়, 'মেটাতে বর্বরের কৌতুকের সাধ করে তুলি আদিগন্ত বাংলা ভূমি মুখোমুখি দ্বন্দ্বের বাসর। পিশাচের ওগড়ানো বিষাক্ত আগুন পিশাচেরই শোণিতে নেভাই আজ। 'তোমার আপন পতাকা' কবিতাতেও একই শপথ—

আবহমান বাংলার বর্বরতম দখলদারও দেখ আজ
কুৎসিততম আঁধারে নির্ঘাৎ হবে লীন।
তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছো অমলিন।
শত কোটি লাঞ্ছনার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে
আজো তুমি মাতা, শুচিশুদ্ধ মাতা সাত কোটি সংশপ্তক
সন্তানের অকাতর তুমি মাতা।

বাংলা মাকে চির অমলিন রাখার সংকল্প ঐ কবিতায় কিন্তু বাংলা মায়ের মুখশ্রীও তো পরিবর্তিত রক্তাক্ত সংঘাতে। রক্তাক্ত বাংলার চিত্রকল্প হাসান হাফিজুর রহমান অঙ্কন করেছেন 'এ এক ভিন্ন মুখ তোমার' কবিতায়। বাংলা মায়ের চির শ্যামল নিসর্গ আজ পরিবর্তিত রক্তের বর্ণে, বাংলার এ রূপ আগে কখনো দেখা যায় নি, ষড়ঋতুর রূপ আজ ভিন্ন বৈচিত্র্য লাভ করেছে—

রক্তস্রোতে ভাসে দিব্য মুখ তোমার,
এ এক ভিন্ন মুখ।
শোণিত নিবাসের অধিবাসী তুমি আজ।
মেঘের গর্জনে একাকার করে নিলে
মুহর্মুহু তোপের আওয়াজ,
অধিকার বাতাসের তোড়ে অবিরাম রণদামামার ধ্বনি।
বর্ষার সুখাদ বজ্র ও বিদ্যুৎ
গেরিলার আকাংক্ষিত মৌসুমের বেশ ধ'রে
মর্টারের ভিন্ন হাসি হাসে নিঃশঙ্ক আড়ালে
এবং রাতারাতি
মাঠের নিপুণ কারিগর যত বনে যায়
দুর্নিবার শ্যামল সৈনিক।
যেন যাদু বলে মুহূর্তে গিয়েছে বদলে
তোমার আপামর কপোতাক্ষ দৃশ্যরাজী

একাত্তরের নয় মাস মৃত্যুর প্রহর গুনেছে নিজদেশে পরবাসী বাঙালী, জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য যে কতো সূক্ষ্ম তা নয় মাস ধরে বাঙালী বুঝেছে; তখন মৃত্যুই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, যারা জীবিত তারা দৈবাৎ বেঁচে গেছেন, প্রতিটি বাঙালীই ছিল মৃত্যুর নিশানা, সেই শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলির ছবি এঁকেছেন হাসান হাফিজুর রহমান 'লুকাই শ্বাসেরও শব্দ' কবিতায়—

বাইরে আঁধারে যেন কোনো ভয়ার্নক

অশরীরী হয়ে গেছে আজকাল, হন্যে কুকুরের মতো
হঠাৎ খেয়ালে হয়তো বা পড়তেও পারে ঝাঁপিয়ে এখুনি।
দূরে কিংবা আশে পাশে কখনো খুব কাছে।
যাচ্ছে শোনা ফুটফাট গুলীর আওয়াজ, ত্রাসে
বুক-কাঁপে, পারিনা শুধোতে 'কে কোথায় গেল ম'রে'
এতটুকু কথা। খটা খট এঁটে ফেলি দরোজা জানালা,
দম বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে পড়ে থাকি ঘরের কবরে। মৃত্যু
এখনো আসেনি বটে, তবে অবারিত মৃত্যুর নিশানা
হয়ে আছি আমরা সবাই।

শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ, নারীর লাঞ্ছনা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানী পশুরা অগণিত বাঙালী মা বোনকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করেছে, যেখানেই পাক সেনা গেছে সেখানেই তারা ঐ নাপাক কাজ করেছে, প্রতিটি পাকিস্তানী ক্যান্টনমেন্ট ও ঘাঁটির সঙ্গে ছিল অপহৃত বাঙালী নারীদের বন্দী শিবির। কতো হতভাগিনী বাঙালী রমণী যে পাকিস্তানী লালসার শিকার হয়েছে সে কলংকিত ইতিহাস চিরকাল অজানা থাকবে। হাসান হাফিজুর রহমান তাদের নিয়ে লিখেছেন 'বীরাঙ্গনা'—

তোমাদের ঠোঁটে দানবের থুথু,
স্তনে নখরের দাগ, সর্বাঙ্গে দাঁতালের ক্ষতচিহ্ন প্রাণান্ত গ্লানিকর।
লুট হয়ে গেছে তোমাদের নারীত্বের মহার্ঘ্য মসজিদ।
উচ্ছিষ্টের দগদগে লাঞ্ছনা তোমরা
পরিত্যক্ত পড়ে আছ জীবনের বিকৃত অলিন্দে নাকচ তাড়িত।

তবু কাল রাত্রির অবসান হয়, সে অমানিশা যতই দীর্ঘ হোক না কেন, বাংলাদেশেও একদিন নয় মাসের দুঃসময়ের অবসান ঘটে, মুক্তির সেই মহেন্দ্রক্ষণ হাসান হাফিজুর রহমান, উপেক্ষা করেননি 'অবশেষে এলো কি সময়' কবিতায়—

আশ্চর্য সুগন্ধ মুক্তির আসে ভেসে হাওয়ার আভাসে,
নবান্নের মদির ঘ্রাণের চেয়েও প্রাণজয়ী, মনোহর।
যেনবা রূপকথার অভিশপ্ত রাজপুত্র আমরা সবাই
একে একে আবিল খোলসা খুলে
অজগর শরীর থেকে দিব্য দেহে ফিরে যাই।
তাহলে কি দিন এলো পরম কাঙ্ক্ষিত সেই

আমাদের দুঃখিনী বন্ধকী পরমায়ু ফিরে পাব
চির চাওয়া চরাচরে বরাভয় নন্দিত, অলাঞ্ছিত সুন্দর।

প্রয়াত হাসান হাফিজুর রহমান সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন একুশের সংকলন সম্পাদনা ক'রে আর শেষ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প সম্পাদনা ক'রে।

কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নয় মাস বাংলাদেশেই আত্মগোপন করেছিলেন, দেশ ত্যাগ করেননি, মুক্তিযুদ্ধে তিনিও হারিয়েছেন তার সহোদরকে, আপনজন হারানোর আবেগ 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় ধরা পড়েছে সরাসরি—

কবিতায় কি বলব।
যখন আসাদ
মনিরামপুরের প্রবল শ্যামল
হৃদয়ের তপ্ত রুধিরে করেছে রঞ্জিত,
সারা বাংলায় আজ উড্ডীন
সেই রক্তাক্ত পতাকা।
আসাদের মৃত্যুতে আমি
অশ্রুহীন, অশোক, কেননা
নয়ন কেবল বজ্রবর্ষী; কেননা
আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখনো পশুদের প্রহারের
চিহ্ন; কেননা আমার বৃদ্ধা মাতার
কণ্ঠে নেই আর্ত-হাহাকার, নেই
অভিসম্পাত-কেবল
দুর্মর ঘৃণার আগুন; কোন
সান্ত্বনা বাক্য নয়, নয় কোন
বিমর্ষ বিলাপ; তাকে বলিনি
তোমার ছেলে আসন্ন ফিরে
হাজার ছেলে হয়ে আর কেঁদো না মা; কেননা
মা তো কাঁদে না;
মার চোখে নেই অশ্রু, কেবল
অনল জ্বালা, দু'চোখে তার

শত্রু হননের আহ্বান।

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, কবিতা অনেক লেখা হয়েছে তবে বঙ্গবন্ধুর ঐ অবিস্মরণীয় ভাষণ নিয়ে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন নির্মলেন্দু গুণ, 'স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায়, এ কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে 'কবি' এবং তার ভাষণকে 'কবিতা' বলা হয়েছে। একাত্তরের রমনার মাঠ অনেক বদলে গেছে, যেখান থেকে বঙ্গবন্ধু তার সেই অমর ভাষণ দিয়েছিলেন সাতই মার্চ, সেখানেই ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। সেখানে কোন বিজয় স্তম্ভ নেই আছে একটি শিশু পার্ক, যা আগে ছিল না। নির্মলেন্দু গুণ অনাগত শিশু, আগামী দিনের কবির উদ্দেশে লিখে রেখে গেলেন সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প কবিতায়—

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে
'কখন আসবে কবি?'—
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান এ সবের কিছুই ছিল না, শুধু একখন্ড আকাশ
যেরকম, সে রকম দিগন্ত প্লাবিত
ধূ–ধূ মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সুবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধূ ধূ মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল
কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত
নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারীবৃন্দ বেশ্যা ভবঘুরে আর
তোমাদের মতো শিশু পাতা কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের।
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,

হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

'স্বাধীনতা' শব্দটি কবে থেকে আমাদের বলতে গিয়ে নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের উপমায় উপস্থিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাতই মার্চের জনসমুদ্রের জোয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন এটাই যথার্থ কারণ বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক বস্তুতঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা। এমন কবিতা বোধ হয় আর কোনদিন লেখা হবে না।

মুক্তিযুদ্ধে প্রায় এককোটি মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছিল, এই সব উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের নয় মাসের জীবন নিয়ে বিশেষ লেখা হয়নি বাংলাদেশের সাহিত্যে। অসীম সাহা 'শরণার্থী' কবিতায় জিজ্ঞাসা করেছেন, কোথায় চলেছে তারা, কোন পুণ্যতীর্থে, এরা কি পুণ্যার্থী সব, দেবতার ক্রীতদাস? এরা কি মথুরামুখী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবনে পাপ, ঘৃণা, ভয় কিংবা দুঃখের জঞ্জাল ধুতে তিমির বিনাশী ঝড়ে ছুটেছে তীর্থ যাত্রী সময়ের সাদা হাত ধরে? লক্ষ কোটি শরণার্থীর মিছিল অসীম সাহার কবিতার ভাষায়—

কারা যায়?
কারা যায় ক্ষুধিত হৃদয় নিয়ে তীব্রতম অন্ধকারে আজ?
দু'পায়ে শৃঙ্খল বেঁধে
কারা যায় নিজস্ব সংসার থেকে
স্বজনের চিতা ফেলে
শিশুর শরীর ফেলে
ভোরের সূর্য ফেলে
মানবিক প্রেম ফেলে
বুনো শুয়োরের শব্দে বাতাস বিবাগী ক'রে
কারা যায় অন্তহীন অজ্ঞাত জীবনে?
এ কেমন মিছিল আজ, এ কেমন দুঃখময় ভাষা

এ কেমন শব্দপাত, নক্ষত্রপতন
আর সংশয়ের গাঢ়তর ছায়া?
এ মিছিলে উচ্চ কোনো কণ্ঠ নেই, উত্তপ্ত বিবেক নেই
উদ্ধত কৃপাণ নেই, বিশ্বাসী শ্লোগান নেই–
শুধুই সংশয়;
মাথায় পাহাড় নিয়ে
হৃদয়ে পাথর নিয়ে
দু'চোখে তৃষ্ণা নিয়ে
গাঢ় অন্ধকার থেকে, নির্মম নরক থেকে
অসহায় নীল কোন গম্বুজের দিকে
যেন পাপ স্খলনের অভিসার।
এরা কি তীর্থযাত্রী, দেবতার ক্রীতদাস
পুণ্যার্থী নারী ও পুরুষ?
এ কি তবে দুঃখ বিলাসী রোদে
আলোকের অভিসারী
লক্ষ কোটি মানুষের ব্যথিত মিছিল?

অসীম সাহার কবিতা রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের কবিরা শুধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কবিতা রচনা করেন নি, কোনো কোনো কবি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধ করেছেন, যাদের একজন রফিক আজাদ, যুদ্ধ জয় শেষে তিনি মুক্ত বাংলার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বেচ্ছায় 'একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ' কবিতায়—

বলেছিলাম
স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবো তোমার কাছে একদিন
কেবল কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছিলাম তোমার কাছে
নতজানু হয়ে, ভিক্ষুকের দীনতায়
সময়দিয়েছিলে:
তোমারও স্বার্থ ছিলো,
আমার স্বার্থ তোমাকে উদ্ধার করা;
তোমার দারুণ বন্দীদশা আমার সহ্য হয়নি।—
তোমার মুখে হাসি ফোটাতে, দামী অলঙ্কারে সাজাতে

ভীরু—কাপুরুষ তোমার প্রেমিক এই আমাকে
ধরতে হলো শক্ত হাতে মর্টার, মেশিনগান
শত্রুর বাংকারে, ছাউনিতে ছুঁড়তে হলো গ্রেনেড।—
হাতিয়ার হাতে দুশমনের মোকাবিলা করলাম,
ক্রলিং করে শত্রুর বাংকারে গ্রেনেড ছুঁড়ে
টুকরো টুকরো করে দিলাম শত্রুর সোনালী স্বপ্নকে।—
ন'মাসে অনেক কৃশ হয়ে গেছো,
নীরক্ত হয়েছো,
চাপল্য কমেছে—উজ্জ্বলতা,
তোমার চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে,
অনেক অনেক বদলে গেছো তুমি।—
তবুও তোমার কাছে আত্মসমর্পণে সুখ আছে।—

মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে মুক্তিযুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্র প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা কবির অনুভূতি পাই রফিক আজাদের ঐ কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অগণিত কবি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, এ আলোচনায় নির্বাচিত কয়েকজন কবির কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের কবিদের কি ভাবে স্পর্শ করেছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। যাদের কবিতা নেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ তাদের স্পর্শ করেছে সরাসরি ও গভীরভাবে, যেমন করেছে আরো অনেক কবিকে কিন্তু সব কবির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতার পরিচয় একটি মাত্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে আমরা প্রবীণ ও নবীন কয়েকজন মাত্র কবির মুক্তিযুদ্ধ–বিষয়ক যে কবিতাগুলোর উল্লেখ করেছি তা থেকে বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের তথা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলা কবিতার সমকালীন পাঠকদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা এক নতুন অভিজ্ঞতা আর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি শুধু নয় অভ্রান্ত দলিল কারণ তা উৎসারিত হয়েছে কিছু কবির অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা থেকে, হৃদয়ের গভীর থেকে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় দুই দশক আগে, এই দুই দশকের কবিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের কবিরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অবিরাম কবিতা রচনা করছেন কিন্তু তৃপ্ত হচ্ছেন না, মুক্তিযুদ্ধের বিশালতা, ভয়াবতো, ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বুঝি তারা কোনক্রমেই কবিতার আঙ্গিকে ধরতে পারছেন না কাঙ্ক্ষিত ভাবে। কবিরা একক বা সমষ্টিগত কোন ভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে অঙ্কন করতে

পারছেন না, এমন একটা চেতনা যেমন বাংলাদেশের কবিদের মধ্যেও তেমন সে কবিতার পাঠকদের মধ্যে কাজ করছে, সে কারণে অনবরত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কবিতা রচিত হচ্ছে। এই অতৃপ্তি এই অক্ষমতার যন্ত্রণায় যে শুধু কবিরা ভুগছেন তা নয় আরো বেশী ভুগছেন কথা–সাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা।

সমসাময়িক কোন বিশাল ঘটনা নিয়ে সমকালে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যে কতো কঠিন বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্পীদের সংকল্প মুক্তিযুদ্ধকে চিরন্তন রূপ দিতে হবে তাদের সৃজনশীল কাজের মধ্যে কিন্তু তারা অনুভব করছেন যে কাজটি শুধু কঠিন নয় প্রায় অসম্ভব। হয়তো এটাই স্বাভাবিক, হয়তো আরো সময়ের প্রয়োজন, আত্মস্থ হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মহৎ ও চিরন্তন কিছু সৃষ্টি করা। হয়তো নতুন প্রতিভার প্রয়োজন। হয়তো একক প্রতিভার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। হয়তো যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা হবে, যার বেশীর ভাগ হয়তো কালোত্তীর্ণ হতে পারবেনা। কিন্তু যা রচিত হয়েছে তার মূল্য কম নয় কারণ এ সব রচনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ রয়েছে, যা হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের সৃষ্টিশীল প্রতিভাদের কাজে লাগবে। যেমন একুশের তেমন মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বিবৃত হচ্ছে মাত্র অদ্যাবধি কিন্তু সে ঘটনার স্রষ্টা যে মানুষ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত নায়ক যে সাধারণ মানুষ তার জীবনের কাব্য এখনো রচিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে মানুষের মহত্ব তেমনি উদ্ভাসিত হয়েছে মানুষের পশুত্ব, মুক্তিযুদ্ধে যেমন এক একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিল তেমনি আবার কোন কোন মানব রূপান্তরিত হয়েছিল দানবে। মানব ও দানবের মহাসমর মুক্তিযুদ্ধ সেই মহাসমর এখনো বাংলাদেশের সাহিত্যে কাঙ্ক্ষিত ভাবে চিত্রিত হয়নি, তার জন্যে হয়তো আরো প্রতীক্ষার প্রয়োজন।